প্রথম আলো

তারিখ 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩৩ কলাম ২

চা-বাগানের পড়াশোনায় সরকারের নজর নেই!

মোশতাক আহমেদ ও সুমনকুমার দাশ, সিলেট থেকে ●

সরেজমিন

বিদ্যালয়টিতে ঢুকেই দেখা গেল, ছোট একটি কক্ষে বেশ কয়েকজন শিশু। কেউ পড়ছে, কেউ গল্প করছে। তাদের কেউ কেউ বলল, তারা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে; কেউ আবার বলল তৃতীয় শ্রেণির কথা। এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি কক্ষেই বসে। তারা বলল, শিক্ষক পাশের কক্ষে গেছেন। আর পাশের কক্ষে গিয়ে দেখা গেল, একজন শিক্ষিকা পঞ্চম শ্রেণির কিছু শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন।

বাবলি তানভোল নামের ওই শিক্ষিকা বলেন, বিদ্যালয়টিতে তিনি একাই শিক্ষক। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়িয়ে এই ক্লাসে এসেছেন। সকাল সাড়ে নয়টায় বিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু হয়।

সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানের একটি বেসরকারি ও একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গত মঙ্গলবারের চিত্র এটি। ২৩৭ শিক্ষার্থীর এ বিদ্যালয় চলে বাগান কর্তৃপক্ষের অধীনে। এই বাগানকে ঘিরে ছোট ছোট ১১টি পাড়া আছে, যেখানে খানার সংখ্যা ৭৫৫। আর ১৮ বছরের নিচে শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ৪০৫। তবে এখানে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগানের আশপাশের পাড়াগুলোতে চা-শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা অর্জনের জন্য এনজিওর পরিচালিত এক কক্ষবিশিষ্ট পাঁচটি বিদ্যালয় রয়েছে।

মালনীছড়া, খাদিম ও বড়জান চা-বাগানেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। অভিযোগ আছে, বিভিন্ন কারণে এখানে সরকারের নজর নেই।

তবে সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নূরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের নজর নেই—এই অভিযোগ সঠিক নয়; বরং সরকার এখানে বিদ্যালয় করতে চায়, কিন্তু বাগানের শ্রমিক কিংবা কর্তৃপক্ষ এগিয়ে না এলে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার এই বক্তব্য মালনীছড়া চা-বাগানের এক শ্রমিকনেতাকে জানালে তিনি বলেন, প্রায় সব বাগানই মূলত পরিচালিত হয় মালিকপক্ষের মাধ্যমে। তাই সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে ওই কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

কয়েকজন শিক্ষার্থী ও সাধারণ চা-শ্রমিকের মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলে প্রতিটি শ্রেণির জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ থাকত। শিক্ষকের সংখ্যা হতো বেশি। ফলে পড়াশোনার পরিবেশও ভালো হতো। একই সঙ্গে মূলধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যেত।

মাধ্যমিকে ওঠার পর ঝরে পড়ে: খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চা-বাগানের শিশুদের অনেকে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাস করলেও মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। মূলত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান দূরে হওয়া এবং অভাবের কারণেই এই ঝরে পড়া। কারণ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনার সুযোগ আছে। মাধ্যমিক স্তরে গেলে খরচের পাশাপাশি সংগ্রামটাও বেড়ে যায়।

খাদিম ও বড়জান চা-বাগানের দুজন শ্রমিক বলেন, তাঁরা প্রতিদিন কাজের মজুরি পান ৮৫ টাকা করে; এর বাইরে প্রতি সপ্তাহে তিন কেজি চাল বা আটা রেশন পাওয়া যায়। এই দিয়ে সংসার চালানোটাই যেখানে কঠিন, সেখানে সন্তানদের পড়ার খরচ কীভাবে দেবেন।

লাক্কাতুরা চা-বাগানের একটি পাড়ার শিশু মুক্তা গোয়ালা বলল, এনজিওচালিত একটি বিদ্যালয় থেকে কোনোমতে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করে কয়েক কিলোমিটার দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু অভাবের কারণে অষ্টম শ্রেণিতে ওঠার পর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা দেওয়ার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

সিলেট সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পুলিন রায় বলেন, লাক্কাতুরা এলাকায় একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হবে।

তবে বিদ্যালয়টি স্থাপন প্রসঙ্গে চা-বাগানের দুজন শ্রমিক বলেন, শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করা হলেই তো হবে না, সেখানে চা-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিশেষ কোটার বরাদ্দ থাকতে হবে।